দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ ...08 JAN 1998...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

পরীক্ষা এলেই আন্দোলন ॥ ক্ষতি কার!

খবরটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকার একটি নামকরা স্কুলের জনৈক শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনী করে মাসে লক্ষাধিক টাকা আয় করেন। কিন্তু তিনি ট্যাক্স দেন না। একটি কলেজের একদল ছাত্র প্রিন্সিপালের বরাবরে আবেদনপত্র লিখেছে। এই আবেদনপত্রটির ১৭টি লাইনে ২১টি বানান ভুল রয়েছে। প্রিন্সিপাল সাহেব ছাত্রদের এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি। খবরটি সুখের না দুঃখের? কথায় আছে এই দেশের শিক্ষকেরা নাকি অবহেলিত। বিশেষ করে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা চাকরি করেন তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই নাজুক। নুন আনতে পান্তা ফুরায়, এই অবস্থা অনেকের। এই বাস্তবতায় একজন শিক্ষক টিউশনী করে লক্ষ টাকা আয় করছেন এটা তো আশার কথা। দৃষ্টান্ত হতে পারেন সম্মানিত এই শিক্ষক। হ্যাঁ, শিক্ষকদের কর্মকান্ড অবশ্যই দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রায় প্রতিটি পরিবারে শিশুদের বেলায় দেখা যায়, স্কুলের খাতায় মাস্টার মশাই যা লিখে দিয়েছেন, সেটাই ঠিক। নট নড়ন নট চড়ন। মাস্টার মশাই ভুল লিখে দিলেও তা শোধরানো যাবে না। শোধরানোর চেষ্টা করলেই শিশু কাঁদতে শুরু করবে। বলবে তার প্রিয় শিক্ষকের কথা- স্যার বলেছেন, এটাই ঠিক। শেখানোর জন্যই তো শিক্ষক। কাজেই তিনি যা বলবেন তা অবশ্যই পালনীয়। কিন্তু তিনি যদি ভুল বলেন অথবা ভুল কিছু করেন-তখন পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।

ঢাকা শহরে শতাধিক হাইস্কুল আছে। কিন্তু হাতেগোনা স্কুলের প্রতি সবার নজর। বছর শুরু হলেই অভিভাবকদের মধ্যে দেখা দেয় মানসিক টেনশন। একটি ভালো স্কুলের খোঁজে শুরু হয় ছুটাছুটি। এই সুযোগে কিছু শিক্ষক খুলে বসেন কোচিং সেন্টার। নিজের বাসার ড্রইং রুমে ব্যাচ সিস্টেমে পড়াশুনা। একদল আসছে অন্যদল চলে যাচ্ছে। কী দারুণ ব্যস্ততা। শিক্ষকও দারুণ আন্তরিক। তার কোচিং সেন্টারের ছাত্র যতবেশী ভাল স্কুলে ভর্তি হতে পারবে, ততবেশী সুনাম। ব্যবসার উন্নতি। অথচ এই শিক্ষককে ক্লাসে আন্তরিকভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। নগরীর নামকরা স্কুলের অনেক শিক্ষক আছেন যারা স্কুলে পড়ানোর ব্যাপারে তেমন আন্তরিক নন। ক্লাসে দায়সারা ভাব। অথচ তার কোচিং সেন্টারে দারুণ আন্তরিক। অনেকে ছাত্র-ছাত্রীদের পরামর্শ দেন- স্কুলের ক্লাসে তোমাদের কী পড়াব? পরিবেশ কোথায়? আমাদের কোচিং সেন্টারে এস। ব্যাপারটা ডাক্তারদের ক্লিনিকের মত। সরকারী হাসপাতালে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নেই। ডাক্তার স্বয়ং পরামর্শ দেন তার ক্লিনিকে ভর্তি হবার। বাধ্য হয়ে রোগী ছোটে ক্লিনিকের দিকে। দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, শুধু ক্লাসে পড়াশুনা করে ভাল রেজাল্ট করা যায় না। নতুন সিলেবাস, নতুন নিয়ম। গ্রামের অনেক স্কুলে স্বয়ং শিক্ষকমন্ডলীও সিলেবাস বোঝেন না। ইংরেজীর অবস্থা তো আরও করুণ। গ্রামের অনেক স্কুলে ইংরেজীর শিক্ষক নেই। অংকের শিক্ষক অথবা সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষক ছেলেদের ইংরেজী পড়ান। কোন কোন স্কুলে স্বয়ং প্রধান শিক্ষক চলে আসেন ক্লাসে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিছু শিক্ষক আছেন যারা আগে নোট বই পড়েন। তারপর ক্লাসে লেকচার দেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দিষ্ট বইয়ের তালিকা দিয়ে বলা হয় 'ঐ নোট বই ফলো করবে'। এই বাস্তবতায় যারা একটু ভাল করার আশায় পড়াশুনা করে তারা প্রাইভেট পড়তে বাধ্য হয়। একই শিক্ষক তার কোচিং সেন্টারে একরকম স্কুলের ক্লাসে অন্যরকম।

ঢাকা নগরীতে ব্যাঙের ছাতার মত গড়ে উঠেছে কোচিং ও কিন্ডার গার্টেন। কোন নীতিমালা নেই। ইদানীং বাড়ি বাড়ি দরজার নীচ দিয়ে কোচিং সেন্টার ও কিন্ডার গার্টেনে ভর্তির লিফলেট দিয়ে আসা হচ্ছে। দারুণ ব্যবসা। বছরের শুরুতে ভর্তি ফি বাবদ ছাত্র-ছাত্রী প্রতি নেওয়া হচ্ছে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা। মাসিক বেতন ৮ শত থেকে ২ হাজার টাকা। সরকারী স্কুলে পড়াশুনার পরিবেশ নেই। কাজেই, বেসরকারী স্কুলই ভরসা। বাধ্য হয়ে অভিভাবকরা কিন্ডার গার্টেনে অথবা কোচিং সেন্টারের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। ঢাকা শহরে ১০০টি স্কুল আছে। এর মধ্যে ১০/১২টি স্কুলের প্রতি সবার নজর। এইসব স্কুলে ভাল রেজাল্ট হয়, তাই সবার নজর থাকে। অবশিষ্ট স্কুলগুলোতে কী শিক্ষক নেই? কী করেন শিক্ষকমন্ডলী? এমনও তো দেখা যায়, বাড়ির পাশের স্কুল ছেড়ে অনেক দূরের স্কুলে ভর্তি হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রী। বাড়ির পাশের স্কুলটি কেন তাকে আকর্ষণ করে না? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার সময় এসেছে। সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলীর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশের জন্য এই লেখা নয়। তরুণ কণ্ঠ থেকে আমাদের জিজ্ঞাসা ঃ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যে অস্থিরতা চলছে, এরজন্য দায়ী কে? ডিগ্রী ক্লাসের একজন ছাত্র বাংলা বানানও শুদ্ধ করে লিখতে পারে না। যে ছেলে বাংলা শুদ্ধ করে লিখতে জানে না সে ডিগ্রী ক্লাসে উঠলো কী করে?

শিক্ষাক্ষেত্রে অস্থিরতা দূর করা জরুরী। একজন ছাত্রনেতা কী শুধু মিছিলই করবেন নাকি তাকেও ক্লাসে বসতে হবে-এই প্রশ্নের সমাধান প্রয়োজন। পরীক্ষা ঘনিয়ে এলেই শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ আন্দোলন শুরু করেন। যেমন এবার শুরু করেছেন দেশের সকল বোর্ডের কর্মচারীরা।

কর্মচারী ফেডারেশনের ৪ (চার) দফা দাবীর মধ্যে মূলতঃ টাস্কফোর্সের রিপোর্ট বাতিল এবং স্ব-স্ব বোর্ডে কম্পিউটার সেল স্থানান্তরের দাবীই মুখ্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, দেশের সকল বোর্ডের সার্বিক কার্যাবলী পরীক্ষা করে বিরাজমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে বাস্তবায়নযোগ্য ফলপ্রসূ সুপারিশ প্রণয়ন করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশের প্রেক্ষিতে অত্র মন্ত্রণালয় থেকে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। উক্ত টাস্কফোর্স তিন মাসাধিককাল প্রতিটি বোর্ড সরেজমিনে পরিদর্শন করে একটি রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করে। উক্ত রিপোর্টে বোর্ডসমূহে বিগত দিনের কিছু অনিয়ম, ত্রুটি উল্লেখ করে এর দূরীকরণার্থে সুপারিশ করা হয়। তাছাড়া পরীক্ষা পদ্ধতি, উত্তরপত্র মূল্যায়ণ ইত্যাদি ব্যাপারেও তাদের সুচিন্তিত সুপারিশ রাখে। টাস্কফোর্সের সুপারিশের কোথাও কর্মচারীদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি। তাছাড়া কম্পিউটার সেল স্ব-স্ব বোর্ডে স্থানান্তরের সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের কার্যনির্বাহী পরিচালককে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখছে-এখনো প্রতিবেদন দাখিল করেনি। প্রতিবেদন পাওয়ার পর এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে। কর্মচারীদের এই ধর্মঘটের ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর জীবন মারাত্মকভাবে হুমকির সম্মুখীন। এ অবস্থার অবসান হওয়া উচিৎ। প্রিয় পাঠক, আসছে নতুন শতাব্দী। বদলে যাবে পৃথিবীর পরিবেশ। শিক্ষা-দীক্ষায় আমরা যদি পিছিয়ে থাকি তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

❑ রেজানুর রহমান